শান্তিনিকেতনে পবিত্র-পরিবার -
১২১ বৎসর আগেকার একটি দৃশ্য

- মাসাইয়ুকি উসুদা

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্মৃতিও স্বাভাবিকভাবে অতীতে, আরও অতীতের দিকে, অবশেষে অল্পবয়সের "স্মৃতিবনের উজ্জ্বল ঝাপসার" মধ্যে চলে যায়। আমার মনের গতিও এই সর্বজন প্রচলিত মধুর পথে প্রবেশ করেছে। কিছু প্রবীণ, কিছু বিগত, কিছু লুপ্ত বিষয় বা ঘটনা সম্বন্ধে বলা এখন আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয় ও আনন্দদায়ক হয়েছে বটে।

শান্তিনিকেতন নিয়ে কিছু লিখবেন – "অঞ্জলির" সম্পাদক রঞ্জনবাবু-র প্রস্তাবে একটু ভাবতে হয়েছে। আজকের দিনের শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে একজন বিদেশী লিখলে তেমন মজার লেখা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ বর্তমান প্রজন্মের বাঙালীরা বোধহয় জানেন না সেই পুরোনো দিনের শান্তিনিকেতনের ছবি আঁকতে পারলে কেমন হয়!

যাইহোক, এই প্রবন্ধে যে বিবরণটি দিতে চলেছি, তা কিন্তু আমার নিজের নয়। একজনের লেখা বই থেকে উদ্ধৃত করব। ১৯৭৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশ করা আমার পি.এইচডি প্রবন্ধের বিষয় ছিল বরিশালের স্বদেশী যুগের জননেতা অশ্বিনী কুমার দত্তের জীবন-সমীক্ষা। গবেষণার সময় একটি বই হাতে পেয়েছিলাম। সেটা দ্বিখণ্ডে প্রকাশিত একজন গৃহবধূর জীবন-চিত্র। মহিলাটি অখ্যাতনামা। ইহলোকে বিশেষ কিছু কীর্তি রেখে যান নি। তা সত্বেও তাঁর স্বামী তাঁর জীবন-কাহিনী লিখেছিলেন কেন? মহিলাটির স্বামী নিজের ভাষায় একথা বলেছেন – "বঙ্গদেশে অন্য কোনও ব্যক্তি নিজের গৃহিণীর জীবন-চিত্র লিখেছেন বলিয়া জানি না। এই দুঃসাহসের কার্য্য শুধু আমিই করিলাম"[১]

এই বইটির লেখক মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, আর যাঁর জীবন-চরিত্র স্বামীর হাতে লেখা হয়েছে, তিনি মনোরমা গুহঠাকুরতা। বইটির নাম "মনোরমার জীবন-চিত্র"। এর প্রথম খণ্ড ১৯১৪ সালে আর দ্বিতীয় খণ্ড ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয়। প্রায় চল্লিশ বছর আগে, সঠিক ভাবে বলতে গেলে ১৯৭২ সালে কলকাতার "অধ্যয়ন" থেকে পুনঃপ্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটির মধ্যে আজ থেকে ১২১ বছর আগেকার শান্তিনিকেতনের যে বিবরণ আছে, তা থেকে উদ্ধৃত করার আগে গুহঠাকুরতাদের কাহিনী ও কথা প্রসঙ্গে একটু বলতে চাই।

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা (১৮৫৮-১৯১৯) স্বদেশী যুগের খ্যাতনামা জননেতা। বাখেরগঞ্জ জেলার প্রসিদ্ধ গ্রাম বানারিপাড়ায় (অনেকেই বিকৃত করে বানরীপাড়া বলে উল্লেখ করে)[২] তাঁর পৈত্রিক নিবাস।

যৌবনে ব্রাহ্মধর্মের সংস্পর্শে এসে তিনি সেই ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রচারক হন। পরে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে হিন্দুধর্মের সাধনপথে ফিরে আসেন। ১২৮৩ সালের বসন্তে (১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে) ১৮ বছর বয়সের মনোরঞ্জন ও ১২ বছর বয়সের মনোরমার বিয়ে হয়। মনোরমার পিতা কালীকুমার তাঁর ব্রাহ্মণভক্তি ও বদান্যতার জন্য "দাতা কালীকুমার" নামে তখনকার বিক্রমপুরের হিন্দু সমাজে পরিচিত ছিলেন। লোকেরা মুখে মুখে "কলিতে কালীকুমার" বলে সম্মান প্রকাশ করত। মনোরঞ্জন তাঁর হাতের রত্ন মনোরমা সম্বন্ধে এমন লিখেছিলেন – "যিনি দেখিতে রূপসী ছিলেন না, বাক্যে পটু ছিলেন না, কার্য্যেও সু-চতুরা ছিলেন না, এমন সাদাসিধে বাঙ্গালী ঘরের একটি মেয়ে[৩] ছিলেন।"

তবে মনোরঞ্জন মনোরমাকে অত ভালবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন কেন? "মনোরমা-কে পাইয়া মনে করিতাম, আমার অপেক্ষা সুখী জগতে আর কেহই নাই। তুমি রাজা হও, বিদ্বান হও, আমার অপেক্ষা সুখী হইতে পারিবে না।"[৪] এমন লিখতে মনোরঞ্জন একটুও দ্বিধা অনুভব করেন নি। তিনি এখানে কিন্তু শ্রদ্ধার কথা বলছেন না, বলছেন ভালবাসার কথা। মনোরমার স্বভাবের মধ্যে যে অতি সরল স্বাভাবিক অমায়িকতা ছিল, তা তুলে ধরার ভঙ্গিটি মনোরঞ্জনের লক্ষণীয়। "মনোরমা বাল্যকাল হইতেই অল্পভাষিণী ছিলেন, কিন্তু অল্পভাষী লোকেরা অনেক সময়েই অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া থাকে, মনোরমা সেরূপ ছিলেন না। প্রফুল্লতা তাহাকে সর্ব্বদা সরস করিয়া রাখিয়াছিল এবং তাঁহার অধরপ্রান্তে মৃদু হাসি সর্ব্বদাই বিরাজিত ছিল।"[৫]

যাইহোক, মনোরমার চরিত্রে যতই আকর্ষণীয় দিক থাক না, শুধু সেই জন্যে মনোরঞ্জন নিজের স্ত্রীর জীবন-চরিত লেখার মত দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হন নি। মনোরমার আসল পরিচয় ছিল "ধ্যান-ধারণা সমাধির জীবন্ত সাক্ষী।"[৬]

মনোরঞ্জন মনোরমা উভয়ের গুরু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে গুরু প্রদত্ত মন্ত্র-নাম জপ শুরু হয়ে যায় এবং মনোরমা অনতিবিলম্বে সমাধিস্থ হন। সমাধি হল সব সাধকের সর্বশেষ গন্তব্য, চূড়ান্ত কাম্য। কিন্তু মনোরমা সেই শেষ অবস্থায় বিনা চেষ্টাতেই পৌঁছান। এমনটি হল কি ভাবে? একটি সম্ভাব্য কারণ হয়ত এই যে পিতা কালীকুমার পর্যন্ত সব পূর্বপুরুষ যে পুণ্য কর্মফল অর্জন করেন, সেই সঞ্চিত ধন অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। অথবা স্বয়ং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যেমন লিখেছিলেন, সেই কারণটিও হয়ত অলক্ষ্যে কাজ করেছিল। তিনি লেখেন, "একটি কুলবধূ সংসারধর্ম করিয়া নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাট ও অভাবের মধ্যে কেমন করিয়া ধর্মলাভ করিতে পারে, মনোরমা তাহারই দৃষ্টান্ত দেখাইতে আসিয়াছিলেন।"[৭]

সমাধি অবস্থাতেও বোধহয় ধাপে ধাপে উন্নতির সোপান থাকে। ক্রমশঃ মনোরমা ইচ্ছানুযায়ী সমাধিস্থ হতে পারার ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। অবশেষে ২৪ বছর বয়সে "কামপ্রবৃত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে"[৮] - এমন অবস্থাতে পৌঁছান। মনোরঞ্জন মনোরমার সমাধিস্থ অবস্থা স্বচক্ষে দেখে অনুভব করেন যে, স্ত্রী যেন নতুন জীবন পেয়েছেন। মনোরমার এর পরেও নিজের বাড়ীতে বাস করতে হলে তাঁর সাধন পথে বিঘ্ন ঘটবে -- এটা বুঝতে পারার পর মনোরঞ্জন তাঁকে স্বাধীনভাবে বসবাসের জন্য এমন কোথাও নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন যেখানে তিনি নির্বিঘ্নে সাধন-ভজন অব্যাহত রাখতে পারবেন।

এর পর দেবীতুল্য মনোরমা-কে কেন্দ্র করে ছোট সন্তান-সন্ততি সহ এই পবিত্র-পরিবারের ভবঘুরে জীবন আরম্ভ হয়। পরে মনোরঞ্জনকে ধর্ম-প্রচারকের কাজ পরিত্যাগ করতে হয় এবং গুরু

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আদেশে এই পবিত্র-পরিবারকে পাঁচটি কঠিন ব্রত পালন করতে হয়, যেমন অর্থোপার্জনের চেষ্টা ত্যাগ করা, কারও কাছে কিছু না চাওয়া, কারও কাছে নিজেদের অভাব না জানানো ইত্যাদি।(১০)

মনোরমাকে বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়ার সময় আত্মীয়স্বজনেরা তুমুল আপত্তি করলেন, তবু সেই পরিবারের আদরের ধন মনোরমা অবিচলিতভাবে স্বামীর সঙ্গে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সংকল্প প্রকাশ করেন। মনোরমার ইচ্ছা অনুযায়ী পরিবারের চলার পথ স্থির হল। আপাতদৃষ্টে মনে হতে পারে, মনোরমার সিদ্ধান্ত পতিব্রতা নারীর ঐতিহ্যগত আদর্শের প্রতিফলন। আসলে কিন্তু এর মধ্য দিয়ে লিঙ্গ নিরপেক্ষতা ভিত্তিক অতি আধুনিক সামাজিক সম্বন্ধ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। বাস্তবিকই মনোরমার এই সিদ্ধান্তে অন্তত যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একটি দম্পতি-কেন্দ্রিক পরিবার বেরিয়ে এল।(১১)

এ রচনায় এই পরিবারের শান্তিনিকেতনে গমনের যে কাহিনীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, সেটা ঘটেছিল মনোরমাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে পরার অনতিবিলম্বে। গ্রাম ছেড়ে বরিশালে থাকাকালীন মনোরমা যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন লাখটিয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার রায় বংশের কন্যা সুশীলা তাঁদের শান্তিনিকেতনে হাওয়া বদলের জন্য কিছুকাল গিয়ে থাকার বন্দোবস্ত করে দেন। সুশীলা ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধু।

গুরুঠাকুরতারা ১২৯৬ সালের ২৬শে আষাঢ় (৯/৬/১৮৮৯) থেকে ১৮ই শ্রাবণ (২/৮/১৮৮৯) পর্যন্ত, অর্থাৎ দেড় মাসের একটু অধিক সময় বোলপুরে ছিলেন।(১২) নিম্নে "মনোরমার জীবন-চিত্র" থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করব।

[বোলপুর যাত্রা] "কলিকাতায় দুই তিন দিন থাকিয়া আমরা বোলপুরে রওনা হইলাম। হাবড়ায় গিয়া জানিলাম, লুপ লাইনের গাড়ী এইমাত্র ছাড়িয়া গিয়াছে। বৈকালে গাড়ী আছে। সে গাড়ী সন্ধ্যার সময়ে বোলপুরে পৌঁছিবে। কি করি ! হাবড়ায় বসিয়া থাকা অথবা বাড়ীতে ফিরিয়া আসা অপেক্ষা একটি লোকাল ট্রেন ধরিয়া কোন্নগর পর্যন্ত যাওয়াই ভাল মনে করিলাম। সেখানে কোনো একটা দোকানে রান্না করিয়া খাইব ভাবিলাম। মহেশ্বর পাসার শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ ঘোষ বি.এ. আমাদিগকে ট্রেনে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন, তিনি কোন্নগর অবধি আমাদের সঙ্গে চলিলেন। সেখানে নামিয়া স্টেশনের কাছে একটা বাগানবাড়ী পাইলাম। মুদীর দোকানও কাছেই ছিল। সেই বাগানের মালীকে বলিয়া সেখানে খিচুড়ী রান্না করা হইল। বিকালের ট্রেন ধরিয়া সন্ধ্যাবেলা বোলপুর স্টেশনে পৌঁছিলাম। ঠাকুরবাবুদের আদেশানুসারে বোলপুর শান্তিনিকেতনের আশ্রমধারী শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় (ইনি এখন একজন বিখ্যাত বাংলা লেখক) মনোরমার জন্য স্টেশনে পাল্কী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা নির্দ্দিষ্ট ট্রেনে না পৌঁছানোয় বেহারাগণ স্টেশন হইতে ফিরিয়া যাওয়ার ফলে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বোধহয় ভাবিয়াছিলেন যে আমাদের আসা হইল না। তাই তিনি আর স্টেশনে লোক পাঠান নাই। কাজেই আমরা কি করিব, কোথায় যাইব স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। অবশেষে একখানি গরুগাড়ী ভাড়া করা হইল। আমাদের নদী-নালার দেশের লোকেরা গরু-র গাড়ী কখনো চক্ষেও দেখে নাই, আমরাও জীবনে কখনো গরু-র গাড়ী চাপি নাই। গাড়ী কিছুদূর চলিতে না চলিতেই আমরা বমি করিতে লাগিলাম। ছেলেগুলি কাঁদিতে লাগিল। শেষে উপেন (উপেন্দ্রনাথ মজুমদার, সাং মহেশ্বর পাসা, খুলনা) ও আমি ছেলেদুটিকে সঙ্গে করিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। গোরু-র গাড়ীর মতন এমন সুখের বাহন আর নাই, হয় পেটের ভাত হজম করাইবে, না হয় উদ্গিরণ করাইবে। যাহা হউক, প্রায় এক ঘন্টার মধ্যেই আমরা শান্তিনিকেতনে পৌঁছিলাম। যে স্থানে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠিত, সে স্থানটির নাম ভুবনডাঙ্গা।" (১৩)

[প্রকাণ্ড মাঠ] "রাত্রে আশ্রমধারী মহাশয় আমাদের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, ক্লান্তিবশতঃ আমরা সুখে নিদ্রা গেলাম। প্রভাতে উঠিয়া আমরা ঘুরিয়া-ফিরিয়া আশ্রম দেখিতে বাহির হইলাম। বোলপুরে আসা সম্বন্ধে আমি যখন শ্রী শ্রী গুরুদেবের আদেশ চাহিয়াছিলাম, তখন আদেশ প্রদান করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "বোলপুর স্থানটি বেশ। খুব প্রকাণ্ড মাঠ আছে। সেদিকে তাকাইলে একটা অনন্তের ভাব প্রাণে জাগিয়া উঠে।" আজ বাহির হইয়াই তাঁহার সেই কথা স্মরণ হইল এবং তাঁহার কথিত ভাবটি হৃদয়ে অনুভব করিলাম। প্রকাণ্ড মাঠ; আমাদের দৃষ্টিব্যাপিকা রেখা উহার অর্দ্ধপথে নিবৃত্ত হইয়াছে। ছেলেদুটি মনের আনন্দে প্রাণ খুলিয়া মাঠে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। আমাদের সকলের মনেই নূতন দেশে আসার নূতন আনন্দ জাগিয়া উঠিল।" (১৪)

[শান্তিনিকেতনের দৃশ্য] "ভুবনডাঙ্গা বোলপুর সাবডিভিশন হইতে দু মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। ডাঙ্গা-র অর্থ উচ্চভূমি, পশ্চিমে ইহাকে টাঁড় বলে। রায়পুরের সিংহ মহাশয়েরা এইসকল জমির স্বত্ত্বাধিকারী, সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (Mr. S.P.Sinha) মহাশয় এই পরিবারের উজ্জ্বল রত্ন। শান্তিনিকেতনের ছাদ হইতে সিংহ মহাশয়দিগের বাড়ী দেখা যায়। উক্ত সিংহ পরিবারের একজন কর্ত্তার সহিত প্রধান আচার্য মহাশয়ের বন্ধুত্ব ছিল। তিনি তপস্যার জন্য এই ডাঙ্গাটির কতকাংশ মহর্ষিকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে এই মাঠে দিনে ডাকাতি হইত; তখনও সপ্তপর্ণী বৃক্ষমূল খনন করিলে মানুষের মাথা পাওয়া যায়। দিব্য দোতলা প্রাসাদ, ঘরগুলিতে কার্পেট পাতা। আসবাব জিনিসপত্র সমস্তই ধনীজনোপযোগী। প্রাসাদের সঙ্গে সুন্দর বাগান, মাঝে মাঝে শাল বৃক্ষ। সেখানে যা কিছু আছে সমস্তই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ঝর্ ঝরে। অদূরে সপ্তপর্ণী বৃক্ষতলে মর্ম্মর রচিত বেদী। সেই বেদীতে বসিয়া মহর্ষি উপাসনা করিতেন। সেখান হইতে সাঁওতাল পরগণার পর্ব্বতশ্রেণী নীলবর্ণ মেঘমালার ন্যায় প্রতিভাত হয়। সাধনের উপযুক্ত স্থান বটে।"] (১৫)

"আজকাল ভুবনডাঙ্গায় সে নির্জ্জনতা নাই। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সুতরাং ছাত্র ও শিক্ষকগণে ভুবনডাঙ্গা পরিপূর্ণ; খেলাধূলা, গানবাদ্য, বক্তৃতা, অভিনয় ও অধ্যয়ন অধ্যাপনায় স্থানের অবস্থা অত্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তখন সেখানে একটি মাত্র ভবন ছিল "শান্তিনিকেতন"। কিন্তু এক্ষণ প্রকাণ্ড ও সুসজ্জিত ব্রাহ্মমন্দির উঠিয়াছে। রবিবাবুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অনেক ঘর-বাড়ী। তদ্ভিন্ন আরও কয়েকটা বাড়ী উঠিয়াছে। আগে সেখানে গেলে মনে হইত যেন শুধু পরমার্থচিন্তার জন্যই এখানে আসা। এখন সেখানে গেলে অনেক কাজের কথা মনে আসে।" (১৬)

[দৈনন্দিন জীবন] "আশ্রমধারী অঘোরবাবু আমাদের সংসার পাতিয়া দিলেন। কর্ত্তৃপক্ষের হুকুম ছিল যে, যতদিন আমি শন্তিনিকেতনে সপরিবারে থাকিব, আমাদের সমস্ত সংসার খরচ ঠাকুরবাবুদের সরকার হইতে দেওয়া হইবে। আমাদের আবশ্যক মত অঘোরবাবু সমস্ত জিনিসপত্র জোগাড় করিয়া দিলেন। রান্না করার জন্য একটি ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু দুই দিন তাহার রান্না খাইয়াই আমরা বুঝিলাম যে ইহার হাত হইতে মুক্তিলাভ না করিতে পারিলে রক্ষা নাই। কিন্তু তখন মনোরমার শরীর অসুস্থ,

কাজেই বাধ্য হইয়া আরও কিছুদিন তাহার কৃত ব্যঞ্জনরূপ পাচন সেবন করিতে হইল । তবে যথেষ্ট দুগ্ধ ছিল, এ জন্য আহারে অসুবিধা হইত না ।" (১৭)

[পায়চারি ও মেলামেশা] "আমরা ছেলেদের লইয়া সকাল-বিকাল বেড়াইতাম । কন্যাটিকে হিন্দুস্থানী ঝি কোলে করিয়া লইত। উপেন এবং আমি ছেলেদুটির হাত ধরিয়া মনোরমাকে সঙ্গে লইয়া অনেক দূরে বেড়াইতে যাইতাম । ছেলেরা আমাদের হাত ছাড়িয়া দিয়া পাথর কুড়াইত এবং ছুটাছুটি করিত । ফিরিয়া স্নান করিয়া আমরা পারিবারিক উপাসনা করিতাম । অঘোরবাবু এবং কখনো-কখনো তাঁহার পত্নী আমাদের উপাসনায় যোগ দিতেন । বোলপুরের কয়েকটি ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন । ইঁহাদের মধ্যে শ্রী মহাপ্রভুর প্রিয়স্থান কুলীনগ্রামের বসু রামানন্দের সন্তান শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু মহাশয় একজন । ইনি বোলপুরের একজন প্রধান উকীল । ইঁহারা ব্রাহ্ম ধর্মানুরাগী ছিলেন এবং আমার সঙ্গে ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন । যেদিন সময় ও সুবিধা হইত সেদিন মনোরমা ধ্যানে বসিতেন । অঘোরবাবু প্রভৃতির নিকট ইহা গোপন রাখার চেষ্টা হইত, তথাপি বেশী দিন গোপন থাকিল না ।"(১৮)

[প্রাসাদে বাসের প্রতি মনোরমার অনিচ্ছা] "শান্তিনিকেতনের দিব্য প্রাসাদে আমাদের বেশী দিন বাস করা হইল না । একদিন মনোরমা বলিলেন, "এ বাড়ী আমার ভাল লাগিতেছে না । এখানে বাস করিতে কেমন একটা ভাব মনে আসে, যাহা আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে মিশ খায় না ।" আমি বলিলাম, "এমন চমৎকার বাড়ীতে বাস করা আমাদের অবস্থার লোকের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়, বিশেষত স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আমরা এখানে আসিয়াছি । এরূপ অবস্থায় এমন উৎকৃষ্ট প্রাসাদে বাস করিতে তোমার ইচ্ছা হইতেছে না কেন ?" মনোরমা আমার কথার উত্তরে বিশেষ কিছু বলিলেন না, তবে বুঝা গেল তাঁহার মনে কেমন একটা ভাব আসিয়াছে । যাহাহউক, এ বিষয় লইয়া সেদিন আর কোনো কথা হইল না, কেননা বোলপুরে থাকিতে হইলে এই বাড়ীতে থাকিতে হইবে, অন্য উপায় নাই ।" (১৯)

[উপযুক্ত কুটির আবিষ্কার] "ইহার পরে একদিন বিকাল বেলায় বেড়াইতে বেড়াইতে আমরা শান্তিনিকেতনের দক্ষিণ দিকে অনেকটা দূরে চলিয়া গেলাম। সম্মুখেই একটি জলাশয় দেখিলাম। সেটি একটি উচ্চ বাঁধে বেষ্ঠিত দহ । দহটি বেশ বৃহৎ । বৈকালিক সমীর সঞ্চারে উহাতে বীচিমালা নৃত্য করিতেছে । চারিদিকে তালবৃক্ষের শ্রেণী । সেই শ্রেণীবদ্ধ তালবৃক্ষরাজি নীলাকাশে মস্তক তুলিয়া বীচিভঙ্গির সঙ্গে দহের জলে আপনাদের নৃত্যভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতেছে এবং মাথা নাড়িয়া অবিশ্রান্ত সোঁ সোঁ রবে একটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেছে। স্থানটি বেশ নির্জ্জন। দহের উত্তর তীরে একখানা খড়ো বাংলো পোড়ো ঘর হইয়া রহিয়াছে। ঘরের সম্মুখে পূর্ব্বদিকে উঠান । উঠানটি শ্রেণীবদ্ধ আমলকী বৃক্ষে ঘেরা । উহাকে আমলকী কুঞ্জ বলিলে ব্যর্থ নাম হয় না । এই স্থানটি মনোরমার বড়ই পছন্দ হইল । তিনি বলিলেন, যদি এই ঘরখানা আমাদের বাসের জন্য পাওয়া যায়, তবে ভাল হয় । আমি মনে মনে ভাবিলাম যে এরূপ প্রস্তাব শুনিলেও লোকেরা পরিহাস করিবে । এমন প্রাসাদ ছাড়িয়া সাধ করিয়া কোন ব্যক্তি কুটিরে বাস করিতে ইচ্ছা করে ! যাহা হউক, তখন মনোরমার প্রতি আমার এতটা বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে তিনি যাহা কিছু ইচ্ছা করিবেন তাহা কল্যাণকর হইবে, কখনো অমঙ্গলজনক হইবে না । অতএব তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য মনে করিলাম । কিন্তু আমার মনে একটা আশংকা

জন্মিল--যদি বা এই বাড়ীতে বাস করার অনুমতি পাওয়া যায় (আমাদের শান্তিনিকেতনে বাসেরই কথা ছিল), তবু এরূপ নির্জ্জন স্থানে একেবারে সহায়সম্বলহীন হইয়া শিশু সন্তানগুলি লইয়া থাকা উচিত কি না । আমার একটু ভয়ের সঞ্চার হইল । সেকথা মনোরমাকে বলিলাম । শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিয়া আশ্রমধারী অঘোরবাবুকে আমাদের প্রার্থনা জানাইলাম । তিনি প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিলেন । তাঁহার মুখে শুনিলাম যে ঐ আমলকীকুঞ্জই মহর্ষি মহাশয়ের প্রথম সাধন-ভজনের স্থান । ইহা শুনিয়া ঐ স্থানটির উপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিল, এবং মনোরমা যে উৎকৃষ্ট স্থান মনোনীত করিয়াছেন তাহা বুঝিলাম ।"(২০)

[কুটিরে সুখে থাকা] "প্রাসাদ ছাড়িয়া আমরা কুটিরে আসিলাম । মূল্যবান পালঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতে শয্যা পাতিলাম । মনোরমার মনের প্রফুল্লতা দেখিয়া বুঝিলাম, তিনি যেন কেমন একটা বদ্ধ ভাবের মধ্য হইতে মুক্তি লাভ করিলেন । দহের জলে স্নান করিতে আমাদের বড়ই আনন্দ বোধ হইত । পাচক ব্রাহ্মণকে বিদায় করা হইল । মনোরমা দু বেলা স্বহস্তে রান্না করিতে লাগিলেন।(২১) আমরা প্রাণ ভরিয়া আহার করিয়া তৃপ্ত হইতে লাগিলাম । প্রত্যুষে উঠিয়া আমরা সংক্ষেপে পারিবারিক উপাসনা করিতাম। তাহার পর বেড়াইয়া আসিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করা হইত । খোসা ছাড়ান পানিফল দুই পয়সায় প্রায় এক মাস পাওয়া যাইত। উহা আমাদের জলযোগের একটা অঙ্গ হইল। খাঁটি দুগ্ধ তখন ষোল সের এক টাকায় মিলিত । মনে হয় আমাদের চারি সের দুগ্ধের বন্দোবস্ত ছিল । কখনো কখনো সুজির পায়েস অথবা মোহনভোগ দ্বারা আমরা জলযোগ করিতাম । মনোরমা যখন রান্না করিতেন, শ্রীমান উপেন ও আমি তখন কখনো গ্রন্থ পাঠ, কখনো ধর্মালোচনা করিয়া সময় কাটাইতাম । উপেন্দ্র সুকণ্ঠ গায়ক, তাঁহার মুখে ভগবানের নাম শুনিয়া আমরা বড়ই তৃপ্তি লাভ করিতাম । যখন আমাদের হিন্দুস্থানী ঝি গৃহকার্য্যে ব্যস্ত থাকিত, তখন উপেন ও আমি ছেলেদের রক্ষণা-বেক্ষণের ভার গ্রহণ করিতাম। বেলা ১টার সময়ে প্রায় অধিকাংশ দিন মনোরমা ধ্যানে বসিতেন। চারিটার সময়ে আমি তাঁহার কানে অস্ফুট স্বরে

গুরুদত্ত নাম করিয়া তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিতাম। পাঁচ-সাত বার নাম করিলেই তিনি একবার কান ফিরাইয়া নিতেন। মনে হইত যেন তাঁহার বাহ্যজগতে ফিরিতে ইচ্ছা নাই। তথাপি আমি পুনঃ পুনঃ নাম করিয়া তাঁহাকে অমৃতলোক হইতে এই অসার কোলাহলময় মর্ত্যলোকে লইয়া আসিতাম। এক এক দিন তাঁহাকে জাগাইবার সময়ে আমার মনে হইত, আমি মহাপাপ করিতেছি। প্রাণপণ করিয়া যে অবস্থার বিন্দুমাত্র আভাস লাভ করিতে পারি না, অন্যকে সাংসারিক কার্য্যের অনুরোধে সেই অবস্থা হইতে জোর করিয়া ফিরাইয়া আনিতেছি। কিন্তু মনোরমা প্রতিদিনই ধ্যানে বসিবার সময় বলিতেন যে চারিটার সময় আমাকে উঠাইও। ধ্যান-ধারণার গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে পরিজনগণের প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞানও তাঁহার ক্রমশঃ গভীর হইতেছিল। একটি কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, পূর্ব্বে যেমন উপাসনা করিতে বসিলেই তাঁহার সমাধি হইত, বাধা দিতে পারিতেন না, আজকাল সে অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। এখন সমাধির ইচ্ছা না করিলে আর সমাধি হয় না। এ অবস্থাটি বরিশালে থাকিতেই হইয়াছে।

বিকাল চারিটার পরে মনোরমা ধ্যান হইতে উঠিয়া, সকলকে জলখাবার দিয়া নিজেও কিছু আহার করিলে আমরা সকলে মিলিয়া বেড়াইতে বাহির হইতাম সন্ধ্যের সময়ে উপাসনায় যোগ দিয়া তিনি আবার সংসার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। এইরূপে কিছুদিন বেশ মনের আনন্দে কাটিল।"(২২)

[জ্যোতি-দর্শন) "একদিন আমি বোলপুর স্টেশনের দিকে বেড়াইতে যাইতেছিলাম। রাস্তায় একটি শালবন। তখন বেলা ৮টা হইবে। আমি শালবনের শোভায় মুগ্ধ হইয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। হঠাৎ শালবৃক্ষস্থ একটি দাঁড়কাকের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল, আর আমি চক্ষু ফিরাইতে পারিলাম না। সেই কাকের দেহে যে কতই জ্যোতির বিকাশ হইয়াছে, সে জ্যোতি যে কি অপূর্ব জ্যোতি, তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। এই সময় প্রবল বেগে আমার অন্তরে গুরুদত্ত নাম চলিতে লাগিল, চরাচর আনন্দময় হইয়া গেল, আমি সেই জ্যোতির সাগরে ডুবিয়া গেলাম। কাকটি যখন বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া যাইতে লাগিল, আমি তাহাকে অনুসরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে সে যখন উড়িয়া সুদূরে চলিয়া গেল, পলকের জন্য আমি যেন সমস্ত অন্ধকার দেখিলাম। আরও কত রহিয়াছে, কিন্তু আর কাহারও মধ্যে আমার সেই জ্যোতিদর্শন হইল না। আমার মনে হইতে লাগিল যেন এই কাকের মধ্য দিয়া দয়াময় হরি আমাকে তাঁহার অপূর্ব্ব জ্যোতির -- ব্রহ্মজ্যোতির আভাস দেখাইলেন। যাঁহারা দার্শনিক পণ্ডিত, তাঁহারা হয়ত বলিবেন যে, উহা আমার মস্তিষ্কের বিকারপ্রসূত ভ্রান্তিদর্শন, কিন্তু আমি এই দীর্ঘকাল আর একবার ঐ রূপ দর্শনের আশা করিয়া রহিয়াছি। কাক চলিয়া গেলে আমি যেন কি অমূল্য রত্ন হাতে পাইয়া হারাইলাম বোধ হইল। আর স্টেশনে যাওয়া হইল না, ফিরিয়া বাড়ী আসিলাম। তাহার পরের দিন আবার সেই দৃশ্য দর্শনের আশায় লালায়িত হইয়া সেইরূপ সময়ে সেই শালবনে গেলাম, শালবৃক্ষের ডালে ডালে অনেক কাক দেখিলাম, কিন্তু যে বস্তু দেখিতে গিয়াছিলাম তাহা আর দেখিলাম না।"(২৩)

[উপসংহার] : মনোরঞ্জন লিখেছেন -- বোলপুরে "মনোরমা সঙ্গে থাকাতে সকলেরই মন বিশেষ ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ ছিল।"(২৪) আসলে এই দৃশ্যের অবতারণা হয় ঊনিশ শতাব্দীর শেষে, যাকে হিন্দু পুনরুত্থানের যুগ বলা হয়। সেই যুগপ্রবাহেরই দৈনন্দিন চেহারা বলে মনে করি এই দৃশ্যকে। ভারতীয় সভ্যতার উন্নতির যুগে পাঠকবৃন্দ কি ভাববেন, জানার অপেক্ষায় রইলাম।❑

[পাদটীকা]

(১) মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, "মনোরমার জীবন-চিত্র" দ্বিতীয় খণ্ড। (পুনঃপ্রকাশন) কলকাতা ১৯৭২, পৃ ২

(২) মনীন্দ্রকুমার ঘোষ, "সাময়িকী" কলকাতা ১৩৮৪, পৃ ১৩

(৩) মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, "মনোরমার জীবন-চিত্র" দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১৯২

(৪) মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, "মনোরমার জীবন-চিত্র" প্রথম খণ্ড, পৃ ৩

(৫) মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, "মনোরমার জীবন-চিত্র" প্রথম খণ্ড, পৃ ২৯

(৬) মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, "মনোরমার জীবন-চিত্র" দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১৯২

(৭) মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, "মনোরমার জীবন-চিত্র" প্রথম খণ্ড, পৃ ৪

(৮) মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, "মনোরমার জীবন-চিত্র" দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১৮৭

(৯) অশ্বিনী কুমার দত্ত ১৫ই ফাল্গুন ১৩২০ তারিখের পত্রে মনোরঞ্জনকে জানিয়েছেন, "যে দেবীর সঙ্গে তুমি গ্রথিত তাহার কথা মনে হইলে আর এক লোকে উপস্থিত হই।" একটু পরে এ কথাও লিখেছেন, "আমি তাঁহাকে দেবী লিখিলাম, তাহা কিন্তু তোমাদের আজকালকার ধরণের দেবী নহে।" (ঐ প্রথম খণ্ড, পৃ ৪)

(১০) ঐ প্রথম খণ্ড পৃ ১৮১

(১১) এক বিশেষ গণ্ডীর মধ্যস্থ লোকেরা মনোরমাকে গুরুবাক্যের জীবন্ত সাক্ষী আর গীতাতে যা বলা হয়েছে, সেই সব বাণীর প্রতিপন্নকারিনী রূপে সম্মান করতেন। তাদের চেতনার ভিতরে কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক উল্টো আকার ধারণ করল। আসলে মনোরমার সমাধিতে গীতার তত্ত্বের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু তারা ধরে নিলেন যে মনোরমার সমাধি গীতাবাক্যের মতই হয়েছে, তাই সে সত্য ও নির্ভরযোগ্য। মনোরঞ্জন হোক (ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত "গীতার প্রমাণ" দ্রষ্টব্য), ডন পত্রিকার সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হোক (ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ২১, ২৯-৩২, ৪৮-৫১, ১৭৫), এ যুগের প্রায় সব মনীষীদের মনোভঙ্গি অভিন্ন।

(১২) ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃ ১২৭

(১৩) ঐ, পৃ ১১৭-- ১১৮

(১৪) ঐ, পৃ ১১৮

(১৫) ঐ, পৃ ১১৮ --১১৯

(১৬) ঐ, পৃ ১১৯

(১৭) ঐ, পৃ ১১৯--১২০

(১৮) ঐ, পৃ ১২০

(১৯) ঐ, পৃ ১২০-- ১২১

(২০) ঐ, পৃ ১২১ -- ১২২

(২১) মনোরমা গৃহকর্ম করার সময়েও আনন্দ অনুভব করতেন। এ সম্পর্কে তাঁর স্বামী মনোরঞ্জন লিখেছেন, "নামানন্দ সর্ব্বদা বিষয়ানন্দের সঙ্গী ছিল। লুচী ভাজিতেছেন, লুচীগুলি ফুলিয়া উঠিতেছে দেখিয়া বালিকার মতন আনন্দে অধীর হইতেছেন। তরকারী কুটিতেছেন, মুখে আনন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোনও কাজের মধ্যেই আনন্দের বিরাম নাই, কাজেই কোনও কাজেই বিরক্তি নাই।" (ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ১৯১)

(২২) ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃ ১২২--১২৩

(২৩) ঐ, পৃ ১২৩--১২৪

(২৪) ঐ, পৃ ১২৬